উস্তাদ আলি হাম্মুদা'র লেকচার অবলম্বনে

সফলতার সূত্র

বই	**সফলতার সূত্র**
অবলম্বনে	আরিফুল ইসলাম
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
বানান সমন্বয়	মাকামে মাহমুদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

উস্তাদ আলি হাশমীর লেকচার অবলম্বনে

সফলতার সূত্র

আরিফুল ইসলাম

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

সফলতার সূত্র

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২২

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫১৩৮০, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫ ১৩ ৮০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১
অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com -এ**

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২৭০ US $ 20, UK £ 10

SOFOLOTAR SUTRO

Writer : Ariful Islam

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, UnderGround, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01317-851380, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95377-8-6

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

সফল হওয়া আমাদের সকলের এই সুন্দর গ্রহে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শিশু, যুবক বা বৃদ্ধ হোক তা বিবেচ্য নয়, আমাদের বিস্তৃত জীবৎকালের প্রতিটি পর্যায়ে এটি আমাদের অন্তর্নির্মিত ইচ্ছা—সফল হওয়া এবং আরও ব্যাপক সাফল্যের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাওয়া।

কিন্তু সফল হওয়ার পথ সহজ নয়। সাফল্য অর্জনের জন্য পাড়ি দিতে হয় নানা বাধা-বিপত্তি, পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হয় জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতকে। জীবন চলার পথকে সাফল্যমণ্ডিত করতে তাই এমন কিছু উপলব্ধির প্রয়োজন হয়, যা আপনার গভীর জীবনবোধকে জাগ্রত করে তুলতে পারে।

'সফলতার সূত্র' এমনই একটি গ্রন্থ; যা আপনার সফলতার উপলব্ধির কারণ হবে। যা আপনাকে সফল হতে স্বপ্ন দেখাবে। আজকের পৃথিবীখ্যাত সফল ব্যক্তিদের সফলতার গল্প শোনাবে।

বর্তমানে যেখানে অসংখ্য যুবক সফলতার নামে মিথ্যে মরীচিকার পিছে দৌড়ে জীবনকে শেষ করে ফেলছে; সেখানে 'উস্তাদ আলি হাম্মুদার লেকচার অবলম্বনে' আরিফুল ইসলামের অনবদ্য গ্রন্থনা—'সফলতার সূত্র' যদি কোনো একজন পাঠকের জীবনকেও সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে তাহলে তাতেই আমাদের সার্থকতা। আল্লাহ তাদের উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

গ্রন্থটির শরয়ি ও ঐতিহাসিক দিক নিরীক্ষণ করেছেন মাহদি হাসান। বানান সমন্বয় করেছেন মাকামে মাহমুদ। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতএব, বরাবরের মতোই আমি বলব, এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অসুন্দর যত, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতা। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

ভূমিকা

'সফলতা' শব্দটি শুনে যে কেউ চনমনিয়ে ওঠে। এই শব্দটি টনিকের মতো কাজ করে। পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কেউ নেই, যে সফল হতে চায় না। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সে চায় সফল হতে। কেউ শিক্ষার্থী হলে সফলতা চায়, চাকরিজীবী হলে সফলতা চায়, ব্যবসায়ী হলেও সফলতা চায়।

সফলতা অর্জন করতে চাইলে সফলতার সূত্র ধরে আগাতে হয়। ফুটবল খেলায় মাঠে নেমে যেভাবে মন চায় শুট মারলেই ফুটবল খেলার সফলতা অর্জন করা যায় না। ফুটবল খেলায় সফলতা অর্জন করতে চাইলে ওই গোলবারেই শুট মারতে হয়।

সফলতা অর্জন করতে তো সবাই চায়, কিন্তু সফলতা অর্জনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে কয়জনই-বা চায়? সবাই যে যার মতো বলে শুট মারে, বল যেদিকেই যাক। আর সত্যিকারার্থে সফলতা প্রত্যাশী গোলবার লক্ষ্য করেই বলে শুট মারে।

একজন মুসলিম দুনিয়া ও আখিরাত—দুই জায়গায়ই সফল হতে চায়। দুনিয়া ও আখিরাতে কীভাবে সফল হওয়া যায় এই নিয়ে উস্তাদ আলি হাম্মুদার লেকচার অবলম্বনে 'সফলতার সূত্র' বইটি।

উস্তাদ আলি হাম্মুদার লেকচারগুলো সাধারণত হৃদয়স্পর্শী। তাঁর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু আত্মশুদ্ধি, আত্মসংশোধন, মোটিভেশন। কোন বিষয়গুলোর কারণে মানুষ বিপথগামী হচ্ছে, চলার পথে বাধাগুলো কীভাবে দূর করা যায়, কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া ও দুনিয়াতে কীভাবে অবদান রাখা যায় এই নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। নবি-রাসুল, সাহাবি,

তাবেয়িদের জীবনের ঘটনাগুলো বর্তমানের সাথে মিলিয়ে কীভাবে পথচলা যায়, সেই সূত্র তিনি বলার চেষ্টা করেন।

উস্তাদ আলি হাম্মুদার ৩৩টি লেকচার নিয়ে এই বই। বইয়ের একটি প্রবন্ধের নামানুসারে বইটির নামকরণ করা হয়েছে—'সফলতার সূত্র'। বইয়ের প্রতিটি প্রবন্ধ আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। আমাদের বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত। পুরো বই জুড়ে বারবার একই কথা উচ্চারিত হয়েছে—বর্তমান নিয়ে আমরা কী চিন্তা করতে পারি, নিজেকে কীভাবে সংশোধিত করতে পারি, অতীতে যা করেছি সেগুলোর ব্যাপারে কীভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করা যায় এবং ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে বর্তমানকে কীভাবে সাজানো চায়। বইয়ের প্রতিটি প্রবন্ধে মোটামুটি এই বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।

একজন পাঠক নিজের জীবন নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার জন্য 'সফলতার সূত্র' বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কোনো পাঠকের চিন্তায় বইটি নাড়া দিতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। মুহাম্মদ পাবলিকেশনের কর্ণধার আবদুল্লাহ ভাই বইটি নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখছেন। আল্লাহ তাঁর স্বপ্নগুলো পূরণ করুন।

—আরিফুল ইসলাম
কাপাসিয়া, গাজীপুর
৩১ জানুয়ারি ২০২২

সূচিপত্র

সফলতার সূত্র	১১
ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনকারী	১৫
আপনার জ্ঞানার্জনের বয়স কি শেষ?	২২
অন্যের জন্য একই পছন্দ	২৬
যেভাবে মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাবেন	৩৭
শাফায়াত : বিচার দিনের উকিল	৪৬
পুণ্যবানদের সাহচর্য	৫১
গোপন পাপ : একুশ শতকের অগ্নিপরীক্ষা	৫৩
অর্থ ও সতর্কতা	৫৭
ফেসবুকে সময় অপচয়!	৬৪
উপকারী জ্ঞান চেনার উপায়	৬৬
জেনারেল শিক্ষিত হয়েও দ্বীনের খেদমত	৭৩
ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুজাদ্দিদ	৭৬
একজন সফল ব্যক্তির গল্প	৮৪
সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার	৯০
মুসলিম ইতিহাসে আলিমগণের পেশা	৯৬
অতীত জীবন নিয়ে অনুশোচনা	৯৯
একটি অনুপ্রেরণামূলক মন্তব্য	১০৫
ঈমানের ফল : এক নওমুসলিমের গল্প	১০৭
ধার্মিক মা-বাবার অধার্মিক সন্তান	১০৯
ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরি ও তাঁর সময়	১১১
বোতলপূজা	১১৭
দুনিয়া সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি	১১৮
হারাম সম্পদ ও কিছু বিপর্যয়	১২৪
মিথ্যা সাক্ষ্য	১৩১
এক চোরের উপদেশ	১৩২

আমাকে যখন আক্রমণ করা হয়েছিল! ১৩৩
এক দরিদ্র পরিবারের গল্প ১৩৯
ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ১৪১
অবদান ১৪৭
এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতির পতন ১৪৯
কিয়ামতের দিন আফসোস থেকে বাঁচার উপায় ১৫৫
ক্ষমার আশা ১৫৮

সফলতার সূত্র

মানুষ কোনো কিছুর গুরুত্ব বোঝাতে 'কসম' করে থাকে। তখন তারা বলে, 'আল্লাহর কসম করে বলছি'। যখন কেউ এভাবে কোনো কথা বলে, তখন বুঝে নিতে হয় কথাটি আর ১০টি কথার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ যখন কোনো কিছুর কসম করে বলেন, তখন সেটার গুরুত্ব এমনিতেই বেড়ে যায়। সেই কথাটি অন্য সকল কথার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়।

কথার গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহর জন্য একবার কসম করাই যথেষ্ট। সেই জায়গায় আল্লাহ একটি কথা বলার আগে ১১ বার কসম করেছেন! তাহলে সেই কথাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে ভাবা যায়?

সুরা আশ-শামসের শুরুতে আল্লাহ ১১ বার কসম করেন। আল্লাহ যেসব বিষয়ের কসম করেন, সেগুলো হলো—সূর্য, সূর্যের আলো, চন্দ্র, দিন, রাত, আকাশ, পৃথিবী, মানুষ এবং তাঁর নিজের (একাধিকবার)।

> এতগুলো কসমের পর আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেন—'সে সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।' [সুরা আশ-শামস ৯১: ৯-১০]

আল্লাহ সফলতার সূত্র বলে দেন। আল্লাহ এটাও জানিয়ে দেন কারা ব্যর্থ। মানুষ স্বভাবত চায় সফল হতে, ব্যর্থ হতে কেউই চায় না। আমার কাছে প্রায়ই কিছু মানুষ এসে বলে, তারা মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করেন না, কেমন যেন অস্থিরতা কাজ করে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

মনের অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণের অনেকগুলো উপায় আছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো নামাজ পড়া। নামাজ মানুষের দুনিয়াবি সমস্যার যেমন সমাধান করতে পারে, তেমনি পারে পরকালের মুক্তি দিতে। মুয়াজ্জিন যখন আজান দেন, তখন আহ্বান করেন

নামাজের দিকে। এই আহ্বানের মধ্যে একটি বাক্য হলো 'হাইয়াল আল ফালাহ'। যার অর্থ হলো, এসো সফলতার দিকে, এসো কল্যাণের দিকে। নামাজের মধ্যেই রয়েছে সফলতা, নামাজের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো, যদি কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?'

সাহাবিরা জবাব দিলেন, 'না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে না।'

> অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'এটা হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।' [সহিহুল বুখারি: ৫২৮]

মানুষের শরীরে ময়লা থাকলে গোসল করার পর যেমন ময়লা থাকে না, তেমনি মানুষ নামাজ পড়তে থাকলে গুনাহ মাফ হয়। যে মাসে এক দিন গোসল করে বা বছরে দুই দিন গোসল করে, তার পাশে বসতে আপনার কেমন লাগবে? সে যদি কোনো খাবার নিয়ে আসে, সেটা খেতে আপনার অস্বস্তি লাগবে না?

তাহলে চিন্তা করুন, যে মাসে দু-একবার বা বছরে দু-তিন দিন নামাজ পড়ে, তার অবস্থা কেমন? তার অন্তরে কেমন ময়লা জমে থাকে? গোসল না করলে যেমন শরীরে ময়লা জমে থাকে, নামাজ না পড়লে অন্তরে গুনাহ জমে থাকে। এই গুনাহের ফলে অন্তরে কালো দাগ বাড়তে থাকে।

ডাক্তাররা যেমন রোগের সাথে ওষুধকে যুক্ত করেন, তেমনি আত্মার পরিশুদ্ধতার সাথে নামাজ যুক্ত। নামাজ ছাড়া আত্মার পরিশুদ্ধি আশা করা যায় না। আর আত্মা পরিশুদ্ধ না হলে আল্লাহ জানিয়ে দেন, সফল হওয়া যায় না।

যারা নামাজ পড়ে না তারা 'কাফির' নাকি 'ফাসিক' এই নিয়ে আলিমগণ আলোচনা করেন, তর্ক-বিতর্ক করেন। আপনি কেন চাইবেন এই আলোচনায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে? আলিমগণের ক্রসফায়ার আলোচনার সামনে নিজেকে দাঁড় করার দুঃসাহস দেখাবার কী দরকার? তারচেয়ে তো অনেক সহজ নামাজ পড়া। আপনি যদি নামাজ পড়েন, আপনার তো ঐ আলোচনা শোনার দরকার নেই। কারণ, আপনি তখন নামাজ ত্যাগকারীর অন্তর্ভুক্ত না। আপনি যখনই নামাজ ত্যাগ করা শুরু করবেন, তখন আপনি নামাজ ত্যাগকারীর বিধানসংক্রান্ত আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়বেন। যার কোনোটিই আপনার জন্য উত্তম না।

অনেকেই নামাজ পড়তে চায় না। কেননা, তারা নামাজের স্বাদ পায়নি। আপনাকে যদি 'হাজীর বিরিয়ানি' খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, যদি বলা হয় অমুক দিন রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হতে, আপনি দেখবেন সময় হিশেব করা শুরু করে দেবেন। কবে সেই দিন

আসবে। দেখা যাবে নির্ধারিত দিন এলে মেজবানের আগেই আপনি সেখানে উপস্থিত হবেন। কারণ, আপনি জানেন হাজীর বিরিয়ানির কেমন স্বাদ।

কিন্তু, যে কখনো সেটা খায়নি, তাকে দাওয়াত দিলে সে কি সমান উৎসাহ দেখাবে? নাকি সে তেমন আগ্রহ দেখাবে না?

নামাজে যারা স্বাদ পেয়েছে এবং যারা স্বাদ পায়নি, তাদের উদাহরণ তেমন। তারা অপেক্ষা করে কখন নামাজে দাঁড়াবে, কখন নামাজের সময় হবে। ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা সময় থাকে। এই সময়টুকু কেউ কেউ নামাজ পড়া ছাড়াই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু, যাদের নামাজ না পড়লে মন ছটফট করে, তারা এই সময়টুকু নামাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তখন তারা দোহার নামাজসহ অন্যান্য সুন্নাত-নফল পড়ে।

যারা নামাজে স্বাদ পেয়েছে, তাদের নামাজ পড়ার ধরনই অন্য রকম। আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাজে দাঁড়াতেন। দূর থেকে দেখলে মনে হতো একটি গাছ দাঁড়িয়ে আছে। পাখিরা তাঁকে গাছ মনে করে তাঁর মাথার ওপর, কাঁধের ওপর বসতো।

শাদ্দাদ ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহ যখন বিছানায় যেতেন, তখন এপাশ-ওপাশ করতেন। তাঁর ঘুম আসতো না। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে।'

অতঃপর বিছানা থেকে উঠে নামাজ পড়া শুরু করতেন। এভাবে নামাজ পড়তেন ফজর পর্যন্ত।[১]

নামাজের প্রতি সালাফদের ভালোবাসা এত বেশি ছিল যে, সবকিছুর চেয়ে তারা নামাজকে প্রাধান্য দিতেন। কারণ, তারা নামাজের স্বাদ অনুভব করতে পারেন।

- আদি ইবনু হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এমন কোনো সময় আসেনি যে, আজান হয়েছে আর আমি অজু ছাড়া আছি।' অর্থাৎ, আজান হবার আগেই তিনি নামাজের অপেক্ষা করতেন।

- সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহর ইনতিকালের পূর্বে তাঁর সন্তানরা কান্না করে। তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তোমরা কেঁদো না। আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখো। তোমাদের বাবার এই মসজিদে ৪০ বছর কখনো তাকবিরে তাহরিমা ছুটে যায়নি।'[২] অর্থাৎ, ইমাম সাহেবের প্রথম তাকবিরে তিনি একটানা ৪০ বছর উপস্থিত ছিলেন।

---

[১] সিফাতুস সাফওয়া : ১/৭০৯

[২] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১৬২।—নিরীক্ষক

- আবু আমর ইবনু আ'লা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন কুরআনের বিখ্যাত সাত কারির একজন। একবার তিনি নামাজে ইমামতি শুরু করার আগে বললেন 'কাতার সোজা করুন'। এটা বলা মাত্র তিনি মাটিতে ঢলে পড়লেন। লোকজন তাঁকে তুলে নিয়ে বিছানায় রাখলো। পরদিন তাঁর জ্ঞান ফিরলো। স্বাভাবিক হবার পর জিজ্ঞেস করা হলো, কী হয়েছে? তিনি জবাব দেন, 'আমি নামাজে দাঁড়ানোর জন্য সবাইকে বললাম 'কাতার সোজা করুন'। এটা বলার পর আমার মনে পড়লো, আল্লাহ আমাকেও তো সোজা হতে বলেন। আমি তো সোজা পথে চলতে পারছি না, অথচ মানুষকে বলছি সোজা হতে!

নামাজ নিয়ে তারা এত ভাবতেন যে, এই ভাবনা তাদেরকে অস্থির করে তুলতো। নামাজের মধ্যে তারা জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজতে চাইতেন। যার নামাজ ঠিক, তার সবকিছু ঠিক।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কাছে লিখেন, 'আমার মতে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নামাজ। অতএব, যে এটার রক্ষণাবেক্ষণ করলো এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করলো, সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করলো। আর যে নামাজকে নষ্ট করলো, সে নামাজ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় দ্বীনি কাজেরও অধিক নষ্টকারী হবে।'[৩]

নামাজ আপনাকে কতটুকু প্রতিদান দেবে, সেটা নির্ভর করছে আপনি কতটা যত্নের সাথে নামাজ আদায় করছেন। অনেকেই বলে যে, কুরআনে আছে নামাজ মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আমি নামাজ পড়ি। কই, নামাজ তো আমাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না!

এটার জবাব হলো, যেহেতু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন নামাজ মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, সেহেতু আল্লাহর কথা সত্য। নামাজ আপনাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছে না, এর মানে হলো যেভাবে নামাজ পড়ার কথা, আপনি সেভাবে নামাজ পড়ছেন না। ভুল কুরআনে নয়; আপনার নামাজে। সাহাবি-তাবেয়ি তথা সালাফগণ যেমন নিষ্ঠার সাথে নামাজ পড়তেন, আপনার নামাজ আর তাদের নামাজের তুলনা করলেই দেখতে পাবেন ব্যর্থতা কোথায়!

[৩] মুয়াত্তা, ইমাম মালিক, হাদিস : ৬।

ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনকারী

টাইম ম্যাগাজিন-এর মতে অ্যামেরিকার সেরা ২৫ জন প্রভাবশালীর একজন হলেন স্টিফেন কভেই। তিনি *নিউইয়র্ক টাইমস* বেস্ট সেলার *The 7 Habits of Highly Effective People* বইয়ের লেখক।

তার একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেন—'I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.'

'আমার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি আমাকে তৈরি করেনি। আমাকে তৈরি করেছে আমার সিদ্ধান্ত।'

আমাদের সবকিছুর জন্য আমাদের আশেপাশের পরিবেশকে দায়ী করতে তিনি আগ্রহী নন। তার মতে, আমরা যে সিদ্ধান্ত নিই, সেই সিদ্ধান্তগুলো আমাদের স্বকীয়তা। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো আমাদের আশেপাশের মানুষদের চেয়ে আলাদা করে তোলে।

সমাজের সবাই যে দিকে যাচ্ছে সেদিকে যাওয়াটা সিদ্ধান্ত নয়। সিদ্ধান্ত হলো সবাই সেদিকে কেন যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে, গেলে কী হবে না হবে সেটা বুঝেশুনে আগানো অথবা অন্যদিকে যাওয়া। যখন আপনি সবার মতো চলতে থাকবেন, তখন আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। আপনি অনুসরণ করছেন। যখন জেনে-বুঝে অনুসরণ করবেন, সেটা হবে সিদ্ধান্ত।

স্টিফেন কভেই সফল মানুষদের ৭টি অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম যে অভ্যাসটি রেখেছেন, সেটা হলো Proactivity; বা সক্রিয়তা।

ইসলামে সক্রিয়তার গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সক্রিয়তার প্রশংসা করেছেন। একটি কাজ যদি দুজন করে, আগে যে করে তার মর্যাদা এবং পরে যে করে তার মর্যাদা সমান নয়। যে নতুন পথের সূচনা করে, সে যতটা ঝুঁকি নেয়, তার দেখানো পথে বাকিদের ততটা ঝুঁকি নিতে হয় না। অনেকেই অলস বসে আছে, একজন দায়িত্ব

নিয়ে এগিয়ে গেল। যে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে গেল, তার মর্যাদা তাদের চেয়ে বেশি, যারা বসে ছিল বা পরবর্তী সময়ে যোগদান করে।

> মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বলেন, 'হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার নিকট এসেছি, যাতে আপনি খুশি হন।' [সুরা ত্বহা ২০ : ৮৪]

আল্লাহ সক্রিয়তার গুণ পছন্দ করেন। তিনি মানুষকে অগ্রবর্তী হতে আহ্বান জানান। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

> তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মতো। [সুরা আল-হাদ্দি ৫৭ : ২১]

অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী লোকদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান নয়। যারা এগিয়ে গিয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অগ্রবর্তীদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বলেন—

> তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছ এবং যুদ্ধ করেছ, তারা (অন্যদের মতো) সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। [সুরা আল-হাদ্দি ৫৭ : ১০]

ইসলাম যখন দুর্বল ছিল, যারা শত নির্যাতনের মুখে ইসলামের পক্ষে থেকেছে, দান করেছে, যুদ্ধ করেছে তারা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে সেরকম কষ্ট করতে হয়নি, যেরকম কষ্ট করেছেন আবু বকর, আলি, বিলাল, খাব্বাব, আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

যারা সক্রিয়, যারা সবার আগে সাড়া দেয় তাদেরকে আল্লাহ যেমন প্রশংসা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তেমনি তাদের জন্য দুআ করেন।

> হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ভোরবেলার মধ্যে তাদেরকে বরকত ও প্রাচুর্য দান করুন।[৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও সেনাবাহিনী পাঠাতে চাইলে ভোরবেলা পাঠাতেন। এই হাদিসের বর্ণনাকারী সাখর আল-গামিদি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসটি অনুসারে বরকত পেতে আগ্রহী ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর ব্যবসায়িক কাজ শুরু করতেন খুব ভোরে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর বরকত তিনি হাতেনাতে পান। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হন।

---

[৪] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ১২১২

আমরা অনেকেই দেরিতে ঘুম থেকে উঠি। দিনের কাজ শুরু করি সকাল ১০-১১টায়। দিনের বরকতের মুহূর্ত আমরা মিস করি। এই সময়টা আমরা ঘুমিয়ে কাটাই। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর বরকত আমরা পাই না। দিনে কাজ করার মতো সময় পাই না। সকালে ফজরের নামাজ পড়ে যদি আমরা পড়তে বসি, কাজ শুরু করে দিই, তাহলে দেখা যেত দুপুর হতেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যেত। হাতে থাকত অফুরন্ত সময়। ফলে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারতাম। আমরা দিন শুরু করি দেরি করে, এজন্য রাতে ঘুমাইও দেরিতে। যার ফলে ফজরের নামাজে সময়মতো উঠতে পারি না!

সক্রিয়তা হলো সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত নিতে সাহস লাগে। যারা সক্রিয় না, দেখবেন তারা অজুহাত খুঁজে বেড়ায়। তাদেরকে যদি বলেন, 'আসেন ভাই, মানুষকে দাওয়াত দিতে যাই, একটা আলোচনা শুনি' তারা সময়ের অজুহাত দেখায়। অথচ যারা সক্রিয়, তারা কোনো না কোনোভাবে সময় বের করে নেয়। যারা সক্রিয়, তারাও তো কোনো কিছুতে ব্যস্ত থাকে। তারা কীভাবে সময় বের করে? কারণ, তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। 'সক্রিয়তা' চর্চা করতে হয়। এই চর্চা থামিয়ে দিলে দেখবেন আপনি হাতে সময় পাবেন না, কোনো কিছু করতে সাহস পাবেন না।

আপনি সক্রিয় হতে গেলে সুযোগের অপেক্ষা করবেন না। সুযোগ আপনি নিজেই করে নেবেন। তখন কেউ আপনাকে দায়িত্ব দেবে না, আপনি নিজেই নিজের কাঁধে দায়িত্ব নেবেন।

আখিরাত যাদের প্রধান লক্ষ্য, এমন না যে তারা দুনিয়া ভুলে নির্জনে বসবাস করে। তারা দুনিয়াতে থাকাবস্থায়ই আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়। তারা খায়, ঘুমায়, কাজ করে, মা-বাবাকে সময় দেয়, স্ত্রী-সন্তানকে সময় দেয়, সমাজকে সময় দেয়; তারপরও তারা আখিরাতের দিকে মনোযোগ দিতে পারে। কারণ, তারা যাই করে না কেন, আখিরাতের লক্ষ্য তাদের সামনে থাকে। ফলে মা-বাবাকে সময় দেওয়া, স্ত্রীকে সময় দেওয়া, উপার্জন করা, পুরোটাই তাদের আখিরাতের কাজে লাগে।

অন্যদিকে, যারা শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত, তাদেরকে আখিরাতের কাজ করতে আলাদা করে সময় বের করতে হয়। তবুও তারা সময় বের করতে পারে না। অথচ, তারা যে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত, সেই দুনিয়ার পেছনে মূল লক্ষ্য যদি থাকে আখিরাত, তাহলে সেই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা তাদের আখিরাতের কাজে লাগত।

যেমন ধরুন, একজন ডাক্তার। তাকে আখিরাতের জন্য আলাদা করে কী করতে হয়? তিনি রোগী দেখছেন, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করছেন, সবার প্রতি যথাসাধ্য ইনসাফ করছেন, অভাবী রোগীকে বিনামূল্যে বা কম ফি-তে দেখছেন, আল্লাহর আদেশ

মেনে চলছেন, নিষেধ থেকে বিরত থাকছেন। তার এই কাজগুলোই তো আখিরাতের কাজ।

নবি-রাসুলগণের পর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। নবি-রাসুলদের পর শ্রেষ্ঠ উপাধি হলো 'আস-সিদ্দিক'। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই উপাধি লাভ করেন।

তাঁর কাছে যখন ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে, তখন তিনি অপেক্ষা করেননি বাকিরা কী করে সেটা দেখতে। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের আগের জীবন সম্পর্কে জানতেন। সেই হিশেবে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা মেনে নেন। তিনি রাসুলুল্লাহর পরিবারের বাইরে প্রথম ব্যক্তি হিশেবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। নিজের মেধা, শ্রম, অর্থ ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। সেই সময় মক্কার শ্রেষ্ঠ লোকগুলোকে তিনি দাওয়াত দেন। তাঁর দাওয়াতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন হলেন—

- উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু
- তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু
- জুবাইর ইবনু আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু
- আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু
- সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

এই পাঁচজন সাহাবি ছিলেন প্রথমদিকের ইসলাম গ্রহণকারী। তারা সবাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রত্যেকেই দুনিয়ার বুকে জান্নাতের সুসংবাদ পান।

এই পাঁচজনের মধ্যে দুজন ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়। তারা হলেন জুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুপাতো ভাই, সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুঃসম্পর্কের মামা।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা করেননি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের আত্মীয়দের গিয়ে দাওয়াত দেবেন, তিনি না গেলেও হবে। তিনি বরং নিজেই যান তাদেরকে দাওয়াত দিতে।

যেকোনো ধরনের নেক কাজে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার চেয়ে এগিয়ে থাকতেন। একদিন সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সাথে বসা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে আজ কে রোজা রেখেছ?'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি।'

'তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো জানাজায় গিয়েছ?'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি।'

'তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো মিসকিনকে খাবার দিয়েছ?'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি।'

'তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো অসুস্থ ব্যক্তিক দেখতে গিয়েছ?'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি।'

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে এসব কাজের সমাবেশ ঘটে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।'[৫]

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালবেলা সাহাবিদের এই প্রশ্নগুলো করেন। তার মানে, দিনের শুরুতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এত এত নেক আমল করেছেন, পুরো দিনে কী পরিমাণ নেক আমল করতেন ভাবা যায়? তিনি একটি নেক আমল করেই বসে থাকেননি। একটির পর আরেকটি করেছেন, তারপর আরেকটি; এভাবে নেক আমল করতেই থাকেন।

যারা নেক আমল করার জন্য সময় পান না, রোগী দেখতে যাবার জন্য সময় বের করতে পারেন না, জানাজায় যাবার জন্য সময় পান না, দান করার জন্য সময় পান না; আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাটি জানার পর তাদের আর অজুহাতের সুযোগ রইল না। নেক আমল করতে হলে যে খুব বেশি প্ল্যান করতে হবে, এমন না। আপনার চোখের সামনেই সুযোগ দেখতে পাবেন, সেই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে।

মনে করুন, জানাজায় যাবার জন্য আপনি ঘর থেকে বের হলেন। ঘর থেকে বের হয়ে কাউকে দান করতে পারেন। জানাজা পড়ে বাড়ি ফেরার পথে একজন অসুস্থকে দেখে আসতে পারেন। এতে করে একই সময়ে তিনটি নেক আমল করা হয়ে গেল। যারা সক্রিয়, তারা এভাবে সুযোগ বের করে নেয়। আর যারা নিষ্ক্রিয়, তারা শুধু অজুহাত খোঁজে।

---

[৫] সহীহ মুসলিম, হাদিস : ১০২৮।–নিরীক্ষক

খন্দক যুদ্ধে মুসলিমরা খুবই চিন্তিত ছিল। মুসলিমদের অবস্থা ছিল জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘের মতো। মদিনার বাইরে শত্রুরা জড়ো হয়েছে, মদিনার ভেতরেও শত্রু। এমন অবস্থায় একজন নওমুসলিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যান। তাঁর নাম নুয়াইম ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যে মুসলিম হয়েছেন, সেটা মদিনার বাইরের শত্রু ও ভেতরের শত্রু কেউই জানতো না। উভয়পক্ষের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলে রাসুলুল্লাহ তাকে বললেন, তিনি কিছু করতে পারলে যেন করেন। উভয়পক্ষের সাথে পূর্বের সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে নুয়াইম ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কৌশল আঁটেন। এমনভাবে কৌশল করেন, যার ফলে শত্রুদের মধ্যকার ঐক্য ভেঙে গেল। শত্রুরা পিছু হটলো।

একজন নওমুসলিম সাহাবি চিন্তা করেননি যে, আরো কিছুদিন যাক, তারপর ইসলামের সেবা করবো। যখনই তিনি সময় ও সুযোগ পান, তখনই নিজেকে ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যে ভয় ও শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, সেটা কেটে গেল। তাঁর কৌশলের কারণে মুসলিমরা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর বাহিনী নিয়ে যাত্রা করছেন। তখন পিঁপড়াদের একটি উপত্যকায় পৌঁছেন। মানুষজন হাঁটার সময় পায়ের নিচে পিঁপড়া আছে কিনা সেটা সাধারণত দেখার চেষ্টা করে না। পিঁপড়া পিষে ফেললেও তার তেমন খারাপ লাগে না, কারণ, সে জানতো না। অন্যদিকে, পিঁপড়াদের কাছে তো এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন।

> একটি পিঁপড়া লক্ষ করলো নবি সুলাইমান আলাইহিস সালামের বাহিনী আসছে। পিঁপড়াটি সবাইকে সতর্ক করে দিলো, 'হে পিঁপড়ারা! তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করো। সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী যেন অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষে না ফেলে।' [সুরা আন-নামল ২৭: ১৮]

নবি সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পশুপাখির ভাষা বোঝার সক্ষমতা দান করেন। তিনি পিঁপড়ার কথা শুনতে পান। ফলে পিঁপড়ার উপত্যকার ওপর দিয়ে না গিয়ে যাত্রাপথ একটু পরিবর্তন করেন।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর প্রেরিত বাণী, মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এই কিতাবে আল্লাহ একটি পিঁপড়ার কথোপকথন উল্লেখ করছেন। পিঁপড়ার এই কথোপকথনের গুরুত্ব কী?

একটি পিঁপড়া যখন দেখতে পেল সবার জীবন শঙ্কার মধ্যে, তখন সে নিজে একা বাঁচার চিন্তা করলো না। সে চাইলে একা একা সরে যেতে পারতো। কিন্তু পিঁপড়াটি বাকিদের জীবন নিয়ে চিন্তা করলো; বাকিরা যেন পিষ্ট না হয় সেজন্য সতর্ক করে দিলো। পুরো

জাতিকে নিয়ে পিঁপড়ার যে দুশ্চিন্তা, পিঁপড়ার সতর্কীকরণের ব্যাপারটি আল্লাহর পছন্দ হলো। তিনি পৃথিবীর মানুষদেরকে এই ছোট্ট পিঁপড়ার ঘটনা শোনালেন। যাতে তারাও বিপদের সময় শুধু নিজের কথা না ভেবে বাকিদের কথা ভাবে, বিপদে পড়লে তারা যেন একা একা পালিয়ে না বেড়ায়।

মানুষের ছোট্ট একটি কাজ ইতিহাসের বাঁক বদলে দিতে পারে। একটি পিঁপড়ার উদ্যোগ তার পুরো সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে দিলো। আগ বাড়িয়ে উদ্যোগ নেওয়া, কোনো সৎকাজ করা আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে, তিনি পবিত্র কুরআনে সেগুলোর কথা উল্লেখ করেন ও প্রশংসা করেন।

একজন মুসলিম নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাকে সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। যখনই কোনো কিছু করার সুযোগ আসবে, সাথে সাথে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। একবার সুযোগ মিস হয়ে গেলে আফসোস করেও কাজ হবে না। বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা সারাজীবন আফসোস করতে থাকে। তাবুক যুদ্ধে যে কয়েকজন সাহাবি অংশগ্রহণ করতে পারেনি, প্রায় দেড় মাসের বেশি তারা আফসোস করে। কখনো কখনো আপনাকেই সুযোগ করে নিতে হবে, সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকলে হবে না। যেমনটা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু করতেন।

আপনার জ্ঞানার্জনের বয়স কি শেষ?

আমাদের একটু বয়স হলেই মনে করি যে, আমরা আর জ্ঞানার্জন করতে পারবো না, আমাদের জ্ঞানার্জনের বয়স শেষ হয়ে গেছে। আমরা আফসোস করে বলি, আবার যদি আমরা বাল্যকালে চলে যেতে পারতাম, তাহলে 'জ্ঞানার্জন শুরু' করতাম। আমরা ধরেই নিয়েছি যে, এই বয়সে আর জ্ঞানার্জন শুরু করা যায় না।

জ্ঞানার্জনের যেমন কোনো বয়স নেই; যেকোনো বয়সেই যেমন মানুষ জ্ঞানার্জন করতে পারে, তেমনি জ্ঞানার্জন শুরুরও বয়স নেই। আপনি যদি শৈশবে শুরু করতে না পারেন, তাহলে যৌবনে শুরু করতে পারেন।

দুজন মানুষের গল্প বলবো, যারা পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করেন অনেক দেরিতে।

১।

একজন সৎ, আমানতদার ব্যবসায়ী হিশেবে নুমান বিন সাবিতের দিন ভালোই চলছিল। নিয়মিত বাজারে যেতেন। কেনাবেচা করতেন, বাড়ি ফিরতেন। নিত্যকার রুটিনের মতো তিনি একদিন বাজারে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় বিশের কোঠায়। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ তাঁকে ডাক দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছো?' নুমান বললেন, 'বাজারে যাচ্ছি।'

বৃদ্ধ মূলত জানতে চাচ্ছিলেন, 'তুমি কার কাছে পড়াশোনা করো?' বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করলে নুমান ঝটপট জবাব দিলেন, 'আমি কারো কাছে পড়তে যাই না।' যুবকের কথা শুনে বৃদ্ধ বেশ অবাক হলেন। এই যুবকের মধ্যে তিনি স্পষ্ট প্রতিভার ঝলক দেখতে পাচ্ছেন আর সে কি না পড়াশোনা করে না! নুমানকে তিনি কাছে ডেকে নিলেন।

বৃদ্ধ নুমানকে বোঝালেন, 'দেখো, তোমার মধ্যে আমি প্রতিভার এক চাপা আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি চাই, তুমি জ্ঞানী-গুণীদের সাথে উঠাবসা করো।'

উপদেশটা নুমানের অন্তরে দাগ কাটলো। বৃদ্ধ কী আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছেন—তোমার মধ্যে প্রতিভার ছাপ আছে! এই একটা কথা তাঁর মনের মধ্যে সুনামির সৃষ্টি করলো। বৃদ্ধর কথা তো ফেলনা না, আর তিনি তো যেনতেন লোকও না। এই বৃদ্ধ হলেন কুফার শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম আশ শাবি রাহিমাহুল্লাহ।

মানিকে মানিক চিনে। কুফার শ্রেষ্ঠ ইমাম আশ শাবি বাজারমুখী যে যুবককে জ্ঞানমুখী করেন পরবর্তীকালে সেই যুবক সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন 'ইমাম আবু হানিফা' নামে।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর প্রধান শিক্ষক ছিলেন হাম্মাদ ইবনু আবি সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর কাছে ইমাম আবু হানিফা পড়াশোনা শুরু করেন ২২ বছর বয়সে।[৬]

২।

২৬ বছর বয়সের এক যুবক জানাজার নামাজ পড়বেন। আসরের নামাজের পর জানাজা। তিনি মসজিদে ঢুকলেন, মসজিদে ঢুকে বসে পড়লেন। একজন মুরব্বি তাকে উঠে দাঁড়াতে বলেন। তাকে বলা হলো, তুমি এত বড় হয়েছ, এখনো জানো না মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগেই ২ রাকাআত নামাজ পড়তে হয়?

যুবক উঠে দাঁড়ালেন। দুই রাকাআত নামাজ পড়লেন।

জানাজার নামাজ শেষে আবারো তিনি মসজিদে গেলেন। তখন সূর্য ডুবি-ডুবি অবস্থা। তিনি ভাবলেন মসজিদে যেহেতু প্রবেশ করছেন, দুই রাকাআত নামাজ পড়ে নেবেন। নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। তখন একজন এসে বলল, 'এ-এ-এ, কী করছ?'

তিনি বললেন, 'আমি তো মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ পড়ছি।'

তখন তাকে বলা হলো—তুমি কি জানো না যে, এখন নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত? এখন নামাজ পড়তে নেই।'

ঐদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি বেশ অপমানিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, এত বড় হয়ে গেলেন অথচ নামাজের বিধি-বিধান ঠিকমতো জানেন না! তিনি ফিকহ নিয়ে পড়াশোনার জন্য আবু আবদিল্লাহ বিন দাহ্ন রাহিমাহুল্লাহর কাছে যান। তাঁর তত্ত্বাবধানে তিন বছর ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' পড়েন।[৭]

---

[৬] আবু জাহরা, ইমাম আবু হানিফা, পৃষ্ঠা ৩০

[৭] ইবনু হাজম আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদগণের তালিকায় আবু আবদিল্লাহ ইবনুদ দাহ্ন নামক কোনো শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি ইমাম মালিকের মুয়াত্তা পড়েছেন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাইদ ইবনুস জাসুর রাহিমাহুল্লাহর কাছে। দেখুন, সিয়ারু আলামিন-নুবালা : ১৩/৩৮০-৩৮১

২৬ বছর বয়সে পুরোদমে জ্ঞানার্জন শুরু করা সেই ব্যক্তিটি হলেন আন্দালুসের বিখ্যাত স্কলার ইমাম ইবনু হাজম রাহিমাহুল্লাহ। ইসলামের ইতিহাসে সেরা ১০ জন পলিম্যাথ স্কলারের মধ্যে তাঁকে ধরা হয়।

ইমাম আজ-জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে আল-ইমাম, আল-আল্লামা, আল-হাফিজ, আল-ফকিহ, আল-মুজতাহিদ ইত্যাদি মর্যাদাপূর্ণ অভিধায় ভূষিত করেন। ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম রাহিমাহুল্লাহ, যাকে বলা হয় 'উলামাদের সুলতান', তিনি ইমাম ইবনু হাজম রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেন—

'ইমাম ইবনু হাজমের (রাহিমাহুল্লাহ) 'আল-মুহাল্লা' ও ইমাম ইবনু কুদামার 'আল-মুগনির' মতো শ্রেষ্ঠ কিতাব আমি আর দেখিনি।'[৮]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুমুল্লাহ ইমাম ইবনু হাজমের জ্ঞানের প্রশংসা করেন।

ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ দুজন ইমাম কিশোর-যুবক বয়সে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে। আপনি যদি শৈশবে জ্ঞানার্জন করতে না পারেন, তাহলে হতাশ হয়ে পড়বেন না। আপনার সময় শেষ হয়ে যায়নি। বর্তমানে এমন অনেকেই ভার্সিটিতে পড়ালেখা শেষ করে আবার মাদরাসায় পড়ে আলিম হয়েছেন।

আপনি কোথায় আছেন এবং কোথায় যেতে চান এটা ঠিক করে নিন। কোন বিষয়ে কতটুকু জ্ঞানার্জন করতে চান, সেটাও ঠিক করে নিতে হবে। গন্তব্য অনুযায়ী মানুষ তার বাহন সিলেক্ট করে। বাড়ি থেকে বাজারে যেতে চাইলে হয়তো রিক্সায়, সাইকেলে যায়। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা গেলে হয়তো বাস বা ট্রেনে যায়। আবার, বাংলাদেশ থেকে অ্যামেরিকায় যেতে চাইলে প্লেনে যায়। আপনি কোন ধরনের জ্ঞানার্জন করে কোথায় যেতে চান সেটার ওপর নির্ভর করছে বাহন।

আপনি যদি ইসলামের একেবারে বেসিক (যা না জানলেই নয়) জানতে চান, তাহলে আপনার নিকটস্থ কোনো আলিমের কাছে গিয়ে টিউশনি টাইপের পড়াশোনা করতে পারেন। অনলাইনে ফরজে আইনের এমন অসংখ্য কোর্স পাওয়া যায়, সেগুলোও করতে পারেন। আপনি যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী জানতে চান, তাহলে বিভিন্ন লেকচার সিরিজ দেখতে পারেন, সিরাতবিষয়ক বই পড়তে পারেন।

কিন্তু আপনি যদি আলিম হতে চান, বড় স্কলার হতে চান, তাহলে আপনাকে ইমাম আবু হানিফার মতো কোনো একজন হাম্মাদ ইবনু আবি সুলাইমান বা ইমাম ইবনু হাজমের মতো কোনো একজন ইবনুল জাসুরের দ্বারস্থ হতে হবে।

---

[৮] সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ইমাম আজ-জাহাবি: ১৩/৩৭৮।

জ্ঞানার্জন করতে হলে আপনার অবশ্যই দুটো জিনিস লাগবে।

- একজন মেন্টর, গাইড, আলিম বা একটি প্রতিষ্ঠান।
- বই-পুস্তক।

এই দুটোর কোনো বিকল্প নেই। শুধু একটি দিয়ে হবে না, অন্যটিও লাগবে। আপনি জ্ঞানার্জন করে নিজেকে কোথায় নিয়ে যেতে চান সেটার ওপর নির্ভর করছে আপনি কোন বাহনে উঠবেন।

যারা বিবিএ-তে পড়ে, তারা নন-মেজর কোর্স হিশেবে 'General Science' পড়ে। এই কোর্সের সাথে বিবিএ'র কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়গুলো জানার জন্য এই কোর্স। এই কোর্স পড়ে কেউ বিজ্ঞানের এক্সপার্ট হবে না।

যারা ভার্সিটিতে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, সিএসসি পড়ছে, তাদের কাছে এই কোর্সটি 'অ-আ-ক-খ' মনে হবে। এই একটি কোর্স পড়ে আপনি যেমন ভার্সিটির সাইন্স ফ্যাকাল্টিতে পড়া কারো সাথে যুক্তিতর্কে যেতে পারেন না, তেমনি যেকোনো বিষয়ের প্রাথমিক বই পড়ে ঐ বিষয়ের এক্সপার্ট হতে পারবেন না। আপনাকে এক্সপার্ট হতে হলে ঐ ডিসিপ্লিনে গিয়ে ভালোভাবে সেটা রপ্ত করতে হবে।

আপনি ইসলামের বেসিক জানতে চান, নাকি স্কলার হতে চান এই প্রশ্ন ঠিক করে নিন। আপনি যেই বয়সেরই হন না কেন, জ্ঞানার্জন শুরু করতে আপনি এখনো বুড়ো হননি। আপনার গন্তব্য ঠিক করে সেই গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে এমন বাহনে উঠুন।

অন্যের জন্য একই পছন্দ

মৌখিক বিশ্বাস তথা ঈমান আনা সত্ত্বেও প্রথম সুযোগে অনেকেই জান্নাতে যেতে পারবেন না। তারা জান্নাতে যাবেন, কিন্তু অনেক হিসাব-নিকাশের পর।

সবার ঈমানের স্তর সমান থাকবে না। ঈমানের স্তরের দিক থেকে কেউ উচ্চস্তরে থাকবে, কেউ নিম্নস্তরে। আমাদের ঈমানের স্তর যেন সর্বোচ্চ থাকে, সেজন্য রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান পূর্ণাঙ্গ করার কিছু পদ্ধতি বলেছেন।

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটা পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[১]

অনেকেই হয়তো হাদিসটি পড়েছেন বা শুনেছেন। এই হাদিসের ওপর আমাদের পূর্ববর্তীগণ কীভাবে আমল করেছেন সেটা শুনলে হয়তো অবাক হবেন।

ইমাম গাজ্জালি রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* বইতে এক লোকের কথা উল্লেখ করেন।

একজন লোকের ঘরে অনেকগুলো ইঁদুর ঢোকে। ঘরে ইঁদুর থাকা মানে ইঁদুরের চেঁচামেচিতে রাতে ঘুম না হওয়া, সারাক্ষণ ইঁদুরের চিঁও-চিঁও শব্দে বিরক্ত হওয়া। ঐ লোককে মানুষজন পরামর্শ দেয় যে, 'একটা বিড়াল বাড়িতে নিয়ে আসো, দেখবে ইঁদুর পালিয়ে যাবে।'

বুদ্ধিটা ভালো। কিন্তু এমন সুন্দর সমাধান পেয়ে লোকটি যা বলল, সেটা বিস্ময়কর। সে বলল—

---

[১] সহিহুল বুখারি : ১৩

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বিড়ালের 'মিঁয়াও' শব্দ শুনে ইঁদুরগুলো যদি আমার প্রতিবেশীর ঘরে চলে যায়। তখন তো তার কষ্ট হবে। আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি না, অন্যের জন্য তা পছন্দ করবো কেন?'

ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় সাত-আটশো বছর আগের। তখনকার সময় হয়তো ইঁদুর মারার ঐরকম কোনো ওষুধ ছিল না; বিড়ালের ওপরই নির্ভর করতে হতো। লোকটি অন্যের কষ্টের ব্যাপারে এতটা সচেতন ছিলেন যে, নিজে শত কষ্ট করতে রাজি, তবুও অন্যকে কষ্ট দিতে নারাজ।

ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানি এই হাদিসটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদিসটি ইসলামের একটি বুনিয়াদি হাদিস।' অর্থাৎ, এই হাদিসে ইসলামের অনেকগুলো মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ইমাম ইবনু জায়িদ আল-মালিকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সচ্চরিত্র-সংক্রান্ত ইসলামের যতগুলো হাদিস আছে, সেগুলোকে চারটি হাদিসে সংক্ষিপ্ত করা যায়।'

তিনি সেই চারটি হাদিস উল্লেখ করেন—

- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।[১০]
- রাগ করো না।[১১]
- কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক আচরণ ত্যাগ করা।[১২]
- তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটা পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[১৩]

এই হাদিসে এমন কী আছে, যার জন্য মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে এত মূল্যায়ন করেছেন? এই হাদিসে এমন কী আছে, যার প্রতি ইতিপূর্বে আমরা ভ্রুক্ষেপ করিনি?

১. ঈমানের পূর্ণতার জন্য

এই হাদিসকে খুব সাধারণ কোনো হাদিস মনে করলে হবে না, হাদিসটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এটির ওপর নির্ভর করছে আমাদের ঈমানের পূর্ণতা। আমরা সারা বছর নামাজ, রোজা, তিলাওয়াত সবকিছু করলাম, কিন্তু স্বার্থপরের মতো আচরণ করলাম; তাহলে

[১০] সহিহুল বুখারি : ৬৪৭৬
[১১] সহিহুল বুখারি : ৬১১৬
[১২] সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭
[১৩] সহিহুল বুখারি : ১৩

বুঝতে হবে আমাদের ঈমানের মধ্যে ঘাটতি আছে। একজন ঈমানদার স্বার্থপরের মতো আচরণ করতে পারে না। নিজের কাজ চুকে গেলে অন্যকে গর্তে ফেলে দিতে পারে না, বরং সে অন্যের কথাও ভাবে।

২. জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে

জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে জান্নাতে যাবার আমল করতে হবে। আর জান্নাতে যাবার আমলগুলোর মধ্যে অন্যের ভালো চাওয়া হলো অন্যতম। নিজের জন্য ভালোটা আর অন্যের জন্য মন্দটা চাওয়া জান্নাতি আমল না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালোবাসে, তার নিকট এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকদের সাথে তেমন ব্যবহার করে, যেমন ব্যবহার সে নিজে পছন্দ করে।[১৪]

৩. জান্নাত লাভ করতে চাইলে

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াজিদ ইবনু আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জান্নাতে যেতে পছন্দ করো?' সাহাবি জবাব দিলেন যে, তিনি জান্নাতে যেতে পছন্দ করেন।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জান্নাত লাভের আমল বলে দিলেন—'তাহলে অন্যের জন্য তা-ই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করো।'[১৫]

৪. আল্লাহর যেভাবে আপনার সাথে ব্যবহার করবেন

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ পুরো বিষয়টি কয়েকটি পয়েন্টে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—

- যে মানুষের সাথে নম্রভাবে আচরণ করে, আল্লাহ তার সাথে নম্রভাবে আচরণ করেন।
- যে মানুষের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন।

---

[১৪] সহিহ মুসলিম : ১৮৪৪, সুনানু আবি দাউদ : ৪২৪৮

[১৫] মুসনাদু আহমাদ : ১৬৬৫৩।—সম্পাদক

- যে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে, আল্লাহ তার সাথে ভালো ব্যবহার করেন।
- যে মানুষের প্রতি উদার হয়, আল্লাহ তার প্রতি উদার হন।
- যে মানুষের উপকার করে, আল্লাহ তার উপকার করেন।
- যে মানুষের দোষ গোপন করে রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে রাখেন।
- যে মানুষের ভালো কাজে বাধা দেয়, আল্লাহও তার ভালো কাজে বাধা দেন।
- মানুষ মানুষের সাথে যেমন ব্যবহার করবে, আল্লাহও তার সাথে তেমন ব্যবহার করবেন।

আমাদের পূর্ববর্তীগণ এই হাদিসের শিক্ষা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তারা অন্যের জন্য সেটা চেয়েছেন, যেটা নিজের জন্য চেয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মাঝেমধ্যে আমি কুরআনের এমন কোনো আয়াত পড়ি, আমার এত ভালো লাগে যে, ইচ্ছে করে সমস্ত মানুষ যদি আয়াতটি জানতো।'

আমাদের পূর্ববর্তীগণ অন্যের সাথে তাদের আমল শেয়ার করার জন্যও চেষ্টা করতেন। উতবা রাহিমাহুল্লাহ ইফতারের সময় চাইতেন তাঁকে কেউ ইফতার দিক। এতে করে ঐ লোকটি রোজা রাখার সওয়াব পাবে ইফতার দেবার মাধ্যমে।

একজনের নামে গুজব রটানো হলে বা একজনের নামে নিন্দা করা হলে তারা তার পক্ষ নিতেন। তারা চাইতেন না অন্যজনকে নিন্দা করা হোক।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে মুনাফিকরা গুজব রটায়। তাঁর চরিত্র নিয়ে অপবাদ দেয়। মুনাফিকদের পাতানো ফাঁদে কয়েকজন সাহাবিও ভুলবশত পা দেন। তারাও আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে 'সন্দেহ' করেন।

এই বিষয়টি তখন মদিনার 'টক অব দ্যা টাউনে' পরিণত হয়। কেউ কেউ কৌতূহলবশত অন্যের কাছে জানতে চান—'শুনছো, কী হয়েছে?'

এমন এক দম্পতি ছিলেন আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উম্মে আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদিনায় যাবার পর তাদের বাড়িতে প্রথম কয়েক মাস থাকেন।

উম্মে আইয়ুব জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে যেসব কথা বলাবলি হচ্ছে সেগুলো শুনছেন?'

আবু আইয়ুব আনসারি স্ত্রীর এমন প্রশ্ন শুনে তার অবস্থান জানিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ, শুনলাম। তবে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।'

এটা বলে তিনি উদাহরণ দিলেন।

'আচ্ছা উম্মে আইয়ুব! বলো তো, তুমি এমন কাজ করতে পারতে?'

এটা শুনে উম্মে আইয়ুব বললেন, 'নাউজুবিল্লাহ! না না, এমন কাজ আমি করতেই পারি না। এটা আমার জন্য অসম্ভব।'

আবু আইয়ুব স্ত্রীকে বোঝালেন, 'দেখো, তোমার চেয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা শতগুণে উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাহলে তিনি এমন কাজ কীভাবে করতে পারেন?'

আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন পদ্ধতির মাধ্যমে শেখালেন, কোনো গুজব প্রমাণিত হবার আগ পর্যন্ত একজন মানুষের ব্যাপারে কীভাবে সুধারণা করতে হয়। নিজের স্ত্রীর উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন, যেখানে তুমি এমন কাজ করতে পারো না, সেখানে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কীভাবে এমন কাজ করতে পারেন?

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অপবাদের বেলায় মুনাফিকদের ফাঁদে পা দেন রাসুলের কবি হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু। হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হবার পর তাওবা করেছেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান।

অপবাদ আরোপের প্রায় ২০ বছর পর একদিন হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে বেড়াতে যান। যে মানুষটি তাঁকে একসময় অপবাদ দিয়েছিল, তাঁর সাথে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেমন আচরণ করবেন? তাঁকে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেবেন? তাঁকে সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেবেন?

না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেগুলো না করে বরং মেহমানকে সম্মানের সাথে গদি বিছিয়ে বসতে দেন। প্রায় ২০ বছর আগে যে ব্যক্তি একজন পবিত্র নারীর চরিত্র নিয়ে অপবাদ দেন, সেই নারী সেটা ভুলে (Forgive & Forget) গিয়ে তাঁকে বসার জন্য আসন পেতে দিচ্ছেন?

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই ছিলেন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বোনের এমন উদারতা দেখে রাগ করলেন। বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তাঁকে গদির ওপর বসতে দিলেন? আপনি কি ভুলে গেলেন তিনি আপনার চরিত্র নিয়ে অপবাদ দিয়েছিলেন?'

আপন ভাই মনে করিয়ে দিলেন। ভাই সত্য কথাই বলছে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কি এবার আপন ভাইয়ের পক্ষালম্বন করে একজন মুসলিম ভাইকে তাঁর প্রায় ২০ বছর আগের কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন? তিনি ভাইকে বললেন—

'হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কাফিরদের কবিতার জবাব দিতেন। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরে শান্তি পেতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন, আমি আশা করি, আল্লাহ আখিরাতে তাঁকে শাস্তি দেবেন না।'[১৬]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আপন ভাইয়ের বিপক্ষে গিয়ে আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত হেফাজত করেন; যিনি কিনা তাঁর ইজ্জত নিয়ে একসময় অপবাদ দেন! তিনি হাসসান বিন সাবিতের ইতিবাচক গুণের প্রশংসা করেন।

তিনি ধরেই নেন যে, হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্ধ হবার মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ তাঁকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন, আখিরাতে তাঁকে আর শাস্তি দেবেন না। তাঁর অন্ধত্বকেও তিনি ইতিবাচক ব্যাখ্যা করছেন। নতুবা তিনি বলতে পারতেন—'দেখছো, আমাকে অপবাদ দেওয়ায় আল্লাহ তোমাকে কী শাস্তি দিলেন!'

মাসরুক ইবনুল আজদা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ি। একবার তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান যে, হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করছেন। সেই কবিতায় হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন—

'তিনি (আয়িশা) সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও জ্ঞানবতী; তাঁর প্রতি কোনো সন্দেহ আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশত খান না (অর্থাৎ গিবত করেন না)।'

একসময় হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু যার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, আজ তিনি তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করছেন! মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ রেগে গেলেন। তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেন তাঁকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দিচ্ছেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন—'তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে (অপবাদ) প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন আজাব।'[সুরা নুর, আয়াত: ১১]

কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এমন লোকদের কাছ থেকে তো দূরে থাকা দরকার; যিনি কিনা প্রায় ২০ বছর আগে আপনাকে অপবাদ দেন!

---

[১৬] তাহজিবু তারিখ দিমাশক লি- ইবনুল আসাকির : ৪/১২৯

উল্লেখ্য, ঐ আয়াত কার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে সেটা নিয়ে নানান মত আছে। কেউ বলেন মদিনার মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাইর ব্যাপারে, কেউ বলেন হাসসান বিন সাবিতের রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারে; মাসরুক এটা মনে করতেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথায়ও সম্মতি পাওয়া যায়।

এবারও আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন—

'অন্ধত্ব থেকে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে?'

অর্থাৎ, তিনি যা শাস্তি পাবার পেয়েই গেছেন, এগুলো নিয়ে আর কথা বলে কী হবে? এবার তিনি হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইতিবাচক গুণের প্রশংসা করে বললেন—

'হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কাফিরদের কবিতার জবাব দিতেন।'[১৭]

আরেকবার কয়েকজন মহিলা আয়িশার রাদিয়াল্লাহু আনহা সামনে হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগালি করেন। তারা হয়তো ভেবেছিলেন যে, যে লোকটি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চরিত্র নিয়ে অপবাদ দিয়েছিল, তাঁকে গালাগালি করলে হয়তো আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেটা পছন্দ করবেন। কিন্তু, না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—

'তাঁকে গালাগালি করো না। আল্লাহ তাদেরকে যে কঠিন শাস্তি দেবার কথা বলেছেন, তা তারা পেয়ে গেছেন। তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি আশা করি, তিনি কুরাইশ কবি আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিসের কবিতার জবাবে রাসুলুল্লাহর প্রশংসা করে যে কবিতা রচনা করেছিলেন, সেটার জন্য আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন।'

এই বলে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহর প্রশংসায় হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর 'হাজাওতা মুহাম্মাদান ফা আজাবতু আনহু' কবিতাটি আবৃত্তি করে মহিলাদেরকে শোনান।[১৮]

তাবুক যুদ্ধে অক্ষম ব্যতীত সবার জন্য অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। সেই যুদ্ধে আজ প্রস্তুতি নেবো, কাল প্রস্তুতি নেবো বলে কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সময়মতো প্রস্তুতি নিতে পারেননি। ফলে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

---

[১৭] সহিহুল বুখারি : ৪১৪৬, সহিহ মুসলিম : ৬২৮৫

[১৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি : ২/৫১৫, সহিহ মুসলিম : ৬২৮৯

যুদ্ধের ময়দানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোঁজ নিলেন কে কে এসেছে আর কে কে আসেনি। তখন খোঁজ পড়লো কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর। একজন বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাঁর ধন-সম্পদ ও অহংকার তাঁকে আসতে দেয়নি।'

কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুপস্থিতিতে তাঁর ব্যাপারে নিন্দা করলেন একজন সাহাবি। ঠিক সেই সময় আরেকজন সাহাবি তাঁর পক্ষে দাঁড়ালেন। তিনি হলেন মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন, 'তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি হিশেবেই জানি।'[১৯]

একজন মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই ভাইয়ের নিন্দা করতে দিচ্ছেন না, তাঁর ব্যাপারে সুধারণা রাখছেন। মুয়াজ ইবনু জাবাল অজুহাত খুঁজছেন, নিশ্চয়ই কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু হয়েছে, যার ফলে তিনি আসতে পারেননি। তিনি তো ভালো মানুষ, আমলদার ব্যক্তি। অহংকার করে পেছনে থাকা তাঁর কাজ না।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর সময়ে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখি করতেন, তাঁর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। প্রত্যেক যুগে যেরকম থাকে আর কী; একজনের সাথে আরেকজনের বড় কোনো মতপার্থক্য থাকলে যেমন হয়।

এমন একজন আলিম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার বিরুদ্ধে অনেক কটু মন্তব্য করতেন, তাঁর সমালোচনা করতেন, সবাইকে তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করে দিতেন। একদিন সেই আলিম ইনতিকাল করেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শিক্ষক ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে 'সুসংবাদ' দিতে যান, যে লোক আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতো, সে ইনতিকাল করেছে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া যখন মৃত্যুসংবাদ শুনলেন, তখন ইন্নালিল্লাহ পড়ার পর ঐ আলিমের মাগফিরাতের জন্য দুআ করেন। অতঃপর তাঁর ছাত্রকে নিয়ে মৃত আলিমের বাড়ি যান, পরিবারকে সান্ত্বনা জানান। মৃতের পরিবারকে ইমাম ইবনু তাইমিয়া জানান— 'তোমাদের কী কী লাগবে বলো, আমি ব্যবস্থা করবো। এই অবস্থায় তোমাদের কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার এমন উদার মানসিকতা দেখে পরিবারটি মুগ্ধ হয়। তারা ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জন্য দুআ করে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, 'ইমাম ইবনু তাইমিয়ার বন্ধুরা বলাবলি করে, 'ইমাম ইবনু তাইমিয়া যেভাবে তাঁর শত্রুদের সাথে আচরণ করেন, আমরা যদি এমনটা

---

[১৯] সহীহুল বুখারি : ৪৪১৮

আমাদের বন্ধুদের সাথে করতে পারতাম।' আমি কখনো তাকে তাঁর প্রতিপক্ষ কারো বিরুদ্ধে বদ-দুআ করতে শুনিনি। যখনই দুআ করতেন, তাহলে তাদের জন্যেও দুআ করতেন।'

আমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেরা কী পরছেন সেই ব্যাপারেও সচেতন ছিল। তাদের ভালো জামা দেখে অন্য কেউ কষ্ট পাবে কিনা এটা তারা ভাবতেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

> এটা হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফ্যাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য। [সুরা কাসাস ২৮: ৮৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার জুতার ফিতা তার সঙ্গীর জুতার ফিতার চেয়ে ভালো হোক, সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

অর্থাৎ, আপনার নিজের খাওয়া-পরার ক্ষেত্রেও আপনি অন্যকে অবজ্ঞা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিশেবে উপস্থাপন করতে গেলে ভাবতে হবে। সালাফগণ এই ছোটোখাটো ব্যাপারেও লক্ষ রাখতেন আত্ম-অহংকার হচ্ছে কিনা।

নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেবার একটি ঘটনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেন। ঘটনাটি পূর্ববর্তী যুগের।

এক লোক অপর একজন লোকের কাছ থেকে একটি জমি কিনলো। জমির ক্রেতা জমি কেনার পর স্বর্ণ ভর্তি একটি কলসি পেলো। ক্রেতা চাইলে সেটা নিজের কাছে রেখে দিতে পারতো। সে ধরে নিতে পারতো, জমির বিক্রেতা তো এই স্বর্ণের কথা কিছু বলেনি।

কিন্তু, সে স্বর্ণের কলসি ফেরত দিতে গেল।

জমির ক্রেতা বলল, 'আমি জমি কিনেছি, এই স্বর্ণগুলো তো কিনিনি। এগুলো আপনি রাখুন।'

মজার ব্যাপার হলো, জমির বিক্রেতা স্বর্ণের কলসি ফেরত নিতে চাইলো না। সে বলল, 'আমি জমি এবং এতে যা আছে, সবই আপনার কাছে বিক্রি করেছি। এটার মালিক এখন আপনি।'

---

[২০] তাফসিরু ইবনু কাসির : ৬/৫৫৩

কিন্তু ক্রেতাও স্বর্ণ নিতে চাচ্ছে না। ক্রেতা মনে করছে স্বর্ণের প্রকৃত মালিক জমির বিক্রেতা, বিক্রেতা মনে করছে জমির প্রকৃত মালিক ক্রেতা। তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলো না। একজন বিচারকের কাছে দুজন গেল।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কি কোনো ছেলে-মেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ, আমার একটি ছেলে আছে।'

'হ্যাঁ, আমার একটি মেয়ে আছে।'

বিচারক বললেন, 'তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েকে একজনের সাথে আরেকজনের বিয়ে দিয়ে দাও। স্বর্ণ থেকে কিছু অংশ তাদের বিয়েতে ব্যয় করো, বাকিটুকু তাদেরকে দিয়ে দাও।'[২১]

এই ঘটনায় দেখা যায়, তারা একজন নিজের চেয়ে অন্যজনকে প্রাধান্য দিচ্ছে, নিজেও যে মালিক হতে পারে, সেটা ভাবছে না। তাদের এই ঘটনা আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের জানিয়ে দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শিক্ষণীয় ঘটনাটি তাঁর সাহাবিদেরকে বলেন, যাতে বাকিরা এটা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

এত কিছুর পর আমরা নিজেকে একটি প্রশ্ন করতে পারি। আমরা কেন নিজেদের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দিতে পারি না? আমাদের কাছে চকচকে নোট আর ছেঁড়া নোট থাকলে চকচকে নোটটা রেখে ছেঁড়া নোটটা কেন মানুষকে দিতে চাই?

আমরা মনে করি অন্য কেউ ব্যর্থ হলে আমরা সফল হয়ে যাবো। এটা কেমন ধারণা? এটা কি বাস্তবে সম্ভব? আমাদের বন্ধুর ব্যবসায় লস হলে কি আমরা লাভবান হবো? আমার বন্ধুর চাকরি চলে গেলে কি আমার চাকরি হয়ে যাবে? আমার বন্ধুর সংসারে অশান্তি হলে কি আমার সংসারে শান্তি হবে? তাহলে কেন আমার বন্ধু, আমার ভাইয়ের মন্দটা আমি চাই?

অন্যের প্রতি আমাদের ঈর্ষা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। আমরা যখন অন্যকে ঈর্ষা করি, এতে করে আমাদের নিজেদের কোনো লাভ হয় না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে?

তিনি বললেন, 'যার অন্তর পরিষ্কার এবং যে সত্যবাদী।'

সাহাবিরা সত্যবাদীর সংজ্ঞা জানেন। কিন্তু কার অন্তর পরিষ্কার সেটা কীভাবে বুঝবেন? এর লক্ষণ কী?

---

[২১] সহীহুল বুখারি : ৩৪৭২।